হাতিদের হাতছানি

সিদ্ধার্থ নাহা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

হাতিও মা ৭

হাতিদের কৃতজ্ঞতা ১৪

বিচারক হাতি ২৩

বুদ্ধিমান হাতিদের স্বজনপ্রীতি ৩২

ভালোবাসা ৩৯

দূরে কোথায় দূরে ৫৫

শুধু মনে রেখো ৬৫

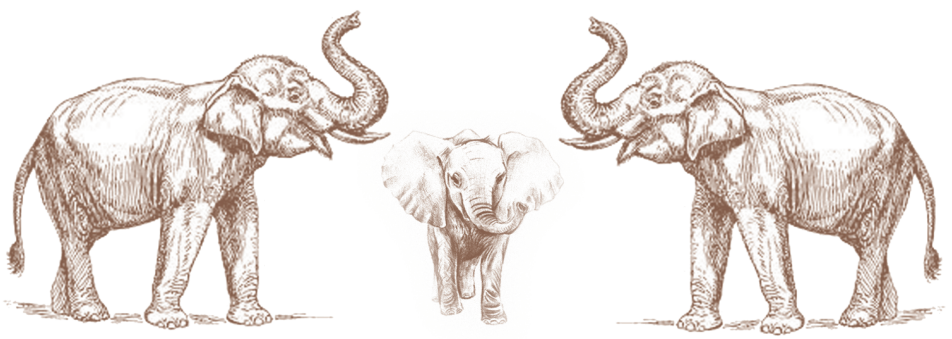

হাতিও মা

পিচ বাঁধানো হলেও রাস্তা খুব চওড়া নয়। রাস্তার একপাশে গরুমারা, অন্যপাশে ঘন মূর্তি অরণ্য। দুই অরণ্যের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। প্রায় নির্জন। হঠাৎ হঠাৎ সাঁই সাঁই শব্দে বেরিয়ে যায় দু'-একটা গাড়ি। মাঝে মাঝে পায়ে হাঁটা কিছু মানুষও। জায়গাটি বন্য জন্তু-জানোয়ারদের প্রিয় আড্ডার এলাকা। হাতি তো আছেই। মাঝে মাঝেই গরুমারা অরণ্য থেকে গণ্ডার, বাইসনরাও চলে আসে। রাস্তার আশপাশে প্রায়ই দেখা মেলে ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতে থাকা কিংবা পেখম মেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা-দুটো অথবা একঝাঁক ময়ূরকে। বানরের দলের এগাছ থেকে ওগাছে আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। সারাদিন ধরে চলতেই থাকে রকমারি পাখিদের কলকাকলি। টানা সুরের মূর্ছনা তুলে যায় ঝিঁঝিঁ এবং রকমারি পোকাদের ডাক। এই রাস্তা পেরিয়ে হাতির দলের গরুমারা ও মূর্তি অরণ্যের মধ্যে হয় চলাচল। সন্ধের পর হাতিদের দখলে চলে যায় রাস্তা। বিশেষত সন্ধের পর হাঁটুডোবা তির তির করে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি মূর্তি নদীতে জল খেতে আসে হাতির পাল। মূর্তি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা চিরে এই নদী ঢুকেছে গরুমারা অভয়ারণ্যে। রাস্তায় নদীর ওপর রয়েছে লোহার রেলিংয়ের সরু সেতু। সন্ধে নামলেই এই রাস্তায় জনমনিষ্যির দেখা মেলে না। যানবাহনও তখন এড়িয়ে চলে এই রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে ঘন বনানী। একপাশে বিছানো নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে তির তির করে বয়ে চলে পাহাড়ি কাচসাদা জলের মূর্তি নদী। চারদিকে সবুজের সমারোহ। রাস্তা ধরে ৩১ নং জাতীয় সড়কের দিকে কিছুটা এগোলে উঁচুনিচু ঢেউ খেলানো জমির ওপর দিগন্ত বিস্তৃত বড়দিঘি চা বাগানের চা গাছের ঝাড়। যতদূর চোখ যায়, মনে হয় যেন পাতা রয়েছে ঢেউ খেলানো চা গাছের সবুজ গালিচা। তাদের মাঝে মাঝে চা গাছকে ছায়া দিতে আকাশের দিকে অনেক উঁচুতে হাত বাড়িয়ে থাকার মতো রকমারি ফুলের পসরা ডালে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে অশোক শিমুল পলাশ জারুল রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছ। জায়গাটির নয়নাভিরাম এমন মোহময় রূপ দেখে মনে হয়, প্রকৃতির সবচেয়ে আকর্ষণীয় নান্দনিক সৌন্দর্যের একটা বড় টুকরো হঠাৎ করে যেন স্বর্গ থেকে ছিঁড়ে এসে ছিটকে পড়েছে এখানে।

বড়দিঘি চা বাগান থেকে বেরিয়ে মাঝে মাঝেই কিছু মহিলা-পুরুষ চা-শ্রমিক এই রাস্তা ধরে এগিয়ে মূর্তি নদীর সেতু পেরিয়ে চলে যায় অনেকটা দূরে মূর্তি অরণ্যের কিছুটা হালকা অংশে। এখানে হালকা অরণ্যের ভেতর থেকে ওরা সংগ্রহ করে গাছের ছোট

ছোট ডাল। শ্রমিক পরিবারগুলি জ্বালানির জন্য। সকালবেলা অরণ্যে ঢুকে সারাদিন গাছের ডাল সংগ্রহ করে সন্ধের আগেই ওরা ফিরে আসে বাগানে। কারণ, সূর্য ডুবলেই হাতির ভয়। কাঠ কুড়োতে দশ-পনেরো জনের দল ঢোকে; অরণ্যে বড় বড় গাছের নিচের দিকের ছোট ছোট ডাল ভেঙে নেয়। কুড়িয়ে নেয় আগে থেকে মাটিতে পড়ে থাকা গাছের ডালও। গাছের বড় বড় ডাল ওরা কখনো কাটে না। ওরা জানে গাছের বড় ডাল কাটলে ওদেরই সর্বনাশ। বড় গাছ না থাকলে পরে ডালপালা পাবে কোথায়। তবুও ফরেস্ট গার্ডরা মাঝে মাঝেই এসে এ বিষয়ে ওদের সতর্ক করে দেয়। ঝামেলা ওদের ওপর।

আজও বারোজনের একটি দলের সঙ্গে গিধনা বড়দিঘি চা বাগান থেকে গিয়েছিল মূর্তির জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহে। দলে আটজন পুরুষ। গিধনাকে নিয়ে চারজন মহিলা। রোজ বাগান থেকে পাঁচ-ছয় কিমি দূরে জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই একদিন গিয়ে অন্তত তিন-চার দিনের কাঠ সংগ্রহ করা হয়। তিন-চার দিনের কাঠ সংগ্রহে অনেকটা দেরি হয়। সাধারণত বিকেলের দিকে মাথায় কাঠের গাঁটরি বেঁধে নিয়ে চা বাগানে ফেরার জন্যে জঙ্গল থেকে ওরা রওনা দেয়। যাতে সন্ধের আগে জঙ্গলের ভেতরের রাস্তা পেরিয়ে আসা যায়। কিন্তু আজ কাঠ সংগ্রহে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। তিনজন ফরেস্ট গার্ডকে নিয়ে বনের বিটবাবু এসে ওদের সঙ্গে খুব ঝামেলা করেছে। গাছের বড় ডাল কাটার অভিযোগে আটকে রাখে ওদের জড়ো করা কাঠ। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে নগদ তিরিশ টাকা বিটবাবুকে দিয়ে ওরা রেহাই পায়। তারপর লাকরি জড়ো করতে করতে সন্ধে প্রায় ছুঁই ছুঁই।

গিধনার পিঠে একটি বড় কাপড়ের ফালিতে বাঁধা ওর তিন মাসের শিশুকন্যা সনকি। বাচ্চাটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে গিধনাকে মাঝে মাঝেই জঙ্গলের একটু ভেতরে গাছের আড়ালে যেতে হয়েছে। ঘরে ফেরার ঠিক আগেও গিধনা জঙ্গলের একটু ভেতরে ঢুকে একটা গাছের কোণে বসে বাচ্চা সনকিকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎই ভেসে আসে সঙ্গীদের আর্তচিৎকার, 'মহাকাল মহাকাল' ('হাতি হাতি')। ঝটিতি সনকিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পরে গিধনা। সঙ্গে সঙ্গে ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে আর্তচিৎকার, 'বাঁচাবে বাঁচাবে, ('বাঁচাও বাঁচাও')। ওর একটু দূরেই আট-দশটা হাতির একটি দল। ওরা এগিয়ে আসছে। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে গাছের আড়ালে থাকা গিধনা আগে দেখতে পায়নি হাতির দলকে। কিন্তু ওর সঙ্গীরা কিছুটা দূর থেকেই হাতির পালকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আর্তচিৎকার করে মাথার কাঠের বোঝা ফেলে জঙ্গল ছেড়ে পাকা রাস্তার দিকে ছুটতে থাকে। নজরে হাতি পড়তেই গিধনাও বাচ্চা কোলে দৌড়তে থাকে। কিন্তু সঙ্গীদের থেকে

ওর দূরত্ব তখন অনেকটা। প্রাণপণে ছুটতে থাকে গিধনা। একবার ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে একটা হাতি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে একটা বড় পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায় গিধনা। কোলের বাচ্চা সনকি ছিটকে চলে যায় কিছুটা দূরে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে গিধনা দেখে হাতিটি আর মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দূরে। বাচ্চাটা কিছুটা দূরে ছিটকে পড়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে। ভয়-আতঙ্কে গিধনার শরীরের রক্ত যেন নিমেষে জল। প্রায় সংবিৎ হারা অবস্থা। মনে হল আর কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই সনকির ওপর বসবে মৃত্যুথাবা। ওকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছড়ে কিংবা পায়ে পিষে মারবে হাতিটি।

কিছুটা সামনে থাকা সঙ্গীরা তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, 'কুদ গিধনা, জোরসে কুদ' ('দৌড়া গিধনা। জেরে দৌড়া')। মুহূর্তে নিজের প্রাণটাই বড় হয়ে যায় গিধনার কাছে। খুব জোরে দৌড়ে কিছুটা এগিয়ে আসে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে হাতিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত। তখনই যেন সংবিৎ ফিরে পায় গিধনা। হুঁশ হয় সনকিকে ফেলে আসার কথা। সনকির আর্তচিৎকারটা যেদিক থেকে ভেসে আসছে সেদিকে তাকায় গিধনা। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার উপায় নেই। কারণ, হাতিটাও সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। মরণ-আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে গিধনা। ফিলিপস বেঞ্জামিন—বিরশা কুহেলি প্রমুখ সঙ্গীরা ভয়ার্ত ভাবে তারস্বরে চেঁচিয়ে গিধনাকে চলে আসার জন্যে ডাকতে থাকে। কিন্তু গিধনা শিশু সনকিকে ছেড়ে যাবে না। হাত-পা ছুড়ে কপাল চাপড়ে আর্তনাদ করতে থাকে গিধনা। সনকির দিকে এগোতে পারছে না হাতিটির ভয়ে। আবার সন্তানকে ফেলে উলটোদিকেও যেতে পারছে না। দু' হাত তুলে, 'হে ভগওয়ান, সনকিকে বাঁচাবে ভগওয়ান', ('হে ভগবান, সনকিকে বাঁচাও ভগবান'), বলে চিৎকার করতে থাকে গিধনা। সময় একটু। গিধনা লক্ষ করে হাতিটি পৌঁছে গেছে সনকির একদম কাছে। অসহায় গিধনা গলা চেরা আর্তনাদ করে চোখ বুজে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। কানে ভেসে আসে সনকির আরও জোরে কান্না।

একসময় চোখ মেলে গিধনা দেখে, সনকিকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে শূন্যে তুলে এপাশ ওপাশ ধীরে ধীরে দোলাচ্ছে হাতিটা। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিধনা ছুটে যায় সেদিকে। তার আগেই হাতিটি শুঁড়ে পেঁচানো সনকিকে শূন্যে দোলাতে দোলাতেই দ্রুত হাঁটতে থাকে গভীর জঙ্গলের দিকে। পিছুপিছু ছুটতে থাকে গিধনা। ঘাড় ঘুরিয়ে দূর থেকে এক ঝলক দেখে সঙ্গীরা ভয়ে কাঠ। বুকের রক্ত হিম গিধনার। গিধনা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে ছুটতে থাকে হাতিটির দিকে। দু' হাত ওপরে তুলে হাতিটির উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, 'হে

মহকালবাবা, মোর ছোওয়াকের জিওয়ান ঘুমায় দেলে। তোকে শতবার গোর লাগি' ('হে গণেশঠাকুর, আমার সন্তানকে মেরো না। আমি তোমায় পুজো দেব')। গিধনা কখনো ছুটতে ছুটতে কখনো দু'হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে বসে আর্তি জানাতে থাকে হাতিটির কাছে। দূর থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে গিধনার সঙ্গীরা। তারাও পিচরাস্তা ছেড়ে এগিয়ে ঢুকে পড়েছে জঙ্গলের কিছুটা ভেতরে।

ছুটতে ছুটতে হাতিটির সঙ্গে গিধনার দূরত্ব কমছে। বুকের দপদপানি বেড়ে যাচ্ছে গিধনার সঙ্গীদের। কেউ কেউ তখনও গিধনাকে ফিরে আসার জন্যে চিৎকার করছে। কেউ কেউ বাক্‌রুদ্ধ। গিধনার সঙ্গে হাতিটির দূরত্ব আর মাত্র কয়েক হাত। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাতিটি। গিধনার দিকে মুখ রেখে ঘুরে দাঁড়ায়। সনকিকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে শূন্যে দুলিয়েই যাচ্ছে হাতিটি। ছোট্ট হাত-পা ছুড়ে মরণ-আর্তনাদে কাঁদছে সনকি। হাতিটি ঘুরে দাঁড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়ে গিধনাও। কয়েক হাত দূরত্বে দু'জন দু'জনের মুখোমুখি। শুঁড়ে সনকিকে দোলাতে দোলাতে হাতির দৃষ্টি গিধনার দিকে। গিধনা মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে দু' হাত জোড় করে চিৎকার করে যাচ্ছে, 'হে মহাকালবাবা, হে গণেশ ভগওয়ান, মোর ছোওয়াক না মারবে। দয়া করবে গণেশ ভগওয়ান' ('হে হাতিবাবা, হে গণেশঠাকুর, আমার বাচ্চাকে মেরো না। দয়া করো গণেশঠাকুর')। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে-আতঙ্কে বাক্‌রুদ্ধ উৎকণ্ঠিত ফিলিপস বেঞ্জামিনরা। ওরা বিস্মিত হয়ে দেখল হাতিটি কয়েক মুহূর্ত গিধনার দিকে তাকিয়ে শুঁড় নামিয়ে মাটিতে আস্তে করে শুইয়ে দিল সনকিকে। একবার গিধনার দিকে শুঁড় তুলে তাকিয়ে ঘুরে ধীর পদক্ষেপে হাতিটি চলে যায় আরও গভীর জঙ্গলের ভেতর। গিধনা ছুটে গিয়ে মাটি থেকে সনকিকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'হে মহাকালবাবা, তয় সচই গণেশ ভগওয়ান আহিস। মোর ছোওয়াকের জিওয়ান ঘুমায়ে দেলে। তোকে শওবার গোর লাগি' ('হে হাতিবাবা, তুমি সত্যিই গণেশঠাকুর। আমার সন্তানের জীবন ফিরিয়ে দিলে। তোমায় শত শত প্রণাম')। ততক্ষণে বেঞ্জামিন, ফুলমতিরা ছুটে আসে গিধনার কাছে। গিধনার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় নামছে জলের ধারা। আনন্দাশ্রু।

দুই

এই ঘটনার বছর ছয়েক আগে এক সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির আপালচাঁদ অরণ্যের ভেতরের সরু মেঠোপথ ধরে যাচ্ছিল কয়েকজন আদিবাসী রমণী। ওরা বনবস্তিবাসী। ওদের গন্তব্যস্থল ছিল কাঠামবাড়ি জঙ্গলের বনবস্তি। এই রাস্তার অরণ্যসীমানা এক জায়গায়

শেষ। এখান থেকে শুরু আনন্দপুর চা বাগান। সবুজ গালিচার মতো চা গাছের সারি। এক জায়গায় চা গাছের সারির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে খুব সরু সবুজ ঘাসের রাস্তা। এই রাস্তা ধরে এগোতে থাকে বনবস্তিবাসী রমণীরা। রাস্তা কিছুটা গিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। রাস্তার এই বাঁক নিতেই ওরা দেখতে পায় তিন-চারটি হাতি চা গাছের ঝাড়ে এবং রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। রমণীরা প্রাণপণে উলটোদিকে ছুটতে শুরু করে। হাতিরা হেলতে দুলতে ওদের দিকে এগোতে থাকে। এক সময় দাঁড়িয়ে যায় হাতিরা। মহিলারা ছুটতেই থাকে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায় দলের অন্য হাতিরা উলটোদিকে ফিরে গেলেও একটা হাতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। নিরাপদ দূরত্বে চলে আসার পর আদিবাসী রমণী রাইতিয়ার হুঁশ হয় তার পিঠের বাচ্চাটি নেই। কয়েক মাসের বাচ্চা মানঝা, রাইতিয়ার পিঠে একটি বড় কাপড়ের ফালিতে বাঁধা ছিল। প্রাণভয়ে ছোটার সময় কখন যে পিঠের বাঁধন আলগা হওয়ায় বাচ্চাটা পড়ে গেছে খেয়াল করতে পারেনি রাইতিয়া। কান্না শুরু হয়ে যায় রাইতিয়ার। চাপড়াতে থাকে নিজের কপাল। হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ফিরে যাওয়া উচিত বস্তিতে। এমনটা সঙ্গীরা বোঝাতে থাকে রাইতিয়াকে। কিন্তু বাচ্চা ফেলে যেতে চায়নি রাইতিয়া।

এদিকে সন্ধে গাঢ় হয়ে আসছে। আবছা অন্ধকারেও দেখা যায় হাতিটি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে। কাজেই সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। কিন্তু বাচ্চা ফেলে কিছুতেই যেতে চাইছিল না রাইতিয়া। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীরা ওকে জোর করেই টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় বস্তিতে। খবর পেয়ে বস্তি থেকে বেশ কিছু লোকজন ছুটে আসে। দূর থেকে ঘোর অন্ধকারেও ওরা বুঝতে পারে হাতিটি তখনও একই জায়গায় ঠায় একা দাঁড়িয়ে। কাজেই এগোবার উপায় নেই। হইহল্লা করে, খালি টিন বাজিয়েও ওরা ফেরাতে পারেনি হাতিটিকে। এদিকে যে কোনো সময় হাতিটি ছুটে আসতে পারে ওদের দিকে। সে ভয়ও আছে। অন্ধকারও গাঢ় হয়ে আসছে। বাধ্য হয়ে অনেকটা রাতে ওরা ফিরে আসে বস্তিতে। জোর করে নিয়ে আসে রাইতিয়াকেও। উৎকণ্ঠায় কেটে যায় বাকি রাত। সবাই ধরে নেয় বাচ্চাটা বেঁচে নেই।

পরদিন খুব ভোরে বস্তির কিছু লোকজন সেখানে গিয়ে অবাক। দেখা যায় হাতিটি এক জায়গাতেই রাস্তার ওপর বসে আছে। খবর পেয়ে গরুমারা অভয়ারণ্য থেকে রেঞ্জ অফিসার কমল দেবনাথ কয়েকজন বনকর্মীকে নিয়ে সেখানে আসেন। তারাও চেষ্টা করে হাতিটিকে সরাতে পারেনি। হাতিটিকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে কয়েকজন বনকর্মী চা গাছের ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। কমল দেবনাথ

তাদের সাবধানে করে দিয়েছিলেন, হাতি যেন ওদের অস্তিত্ব টের না পায়। তাই কোনো শব্দ যাতে না হয়। একটু এগিয়ে বাকি বনকর্মীরা হাতিটির দিকে এবং চা গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকা বনকর্মীদের ওপর নজর রাখতে হবে। অনেকটা দূরে উৎকণ্ঠিত বনবস্তিবাসীরা। তাদের সঙ্গে রয়েছে রাইতিয়াও । ঘাসের সরু রাস্তা এবং চা গাছের ঝাড়ের মাঝে রয়েছে বেশ গভীর চওড়া কাঁচা নালা। চা গাছে জল দেওয়ার জন্যে এই নালা। চা গাছের ফাঁক দিয়ে খুব সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে নালার অনেকটা কাছাকাছি চলে আসেন কয়েকজন বনকর্মী। একজনের হাতে রয়েছে বন্দুক। নালার এপারে ঘাসের রাস্তার ওপর নির্বিকার ভাবে বসে আছে হাতি। হঠাৎ হামাগুড়ি দিতে থাকা একজন বনকর্মী দাঁড়িয়ে পড়েন। রেঞ্জার কমল দেবনাথ চিৎকার করে ওঠেন, 'সর্বনাশ! দাঁড়ালে কেন?'

নালার ঠিক পাশেই চা গাছের ঝাড়ে দাঁড়িয়ে বনকর্মীটি চিৎকার করে ওঠেন, 'স্যার, বাচ্চাটা এখানে।' নালার দিকে হাত তুলে দেখালেন তিনি। বনকর্মী ও বনবস্তিবাসীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় হুটোপাটি, গুঞ্জন, হল্লা। উদ্ভ্রান্ত রাইতিয়া ভয়ভীতি ঝেড়ে হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে নালার দিকে। নালা তখন শুকনো খটখটে। জল নেই। রাইতিয়ার পিছু নেন কয়েকজন বনকর্মী। তারা নাগালে পাওয়ার আগেই রাইতিয়া ঝাঁপ দেয় শুকনো গভীর নালায়। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নালার ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে রাইতিয়া কোলে তুলে নেয় শিশু মানঝাকে। এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় হাতিটিও। জনতার মধ্যে তখন ভয়ার্ত আর্তনাদ। রাইতিয়ার দিকে মুখ রেখে হাতিটি এবার একপা-দু'পা করে পেছতে থাকে। অনেকে বাক্‌রুদ্ধ। কারও কারও কণ্ঠে ভীতির আর্তনাদ। কারও কারও রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। হতভম্ব রেঞ্জার কমল দেবনাথ। হাতিটি একটুক্ষণ শিশুকোলে রাইতিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে শুঁড় একবার ওপরে তুলে ঘুরে গিয়ে হাঁটা দেয় উলটোদিকে গভীর জঙ্গলের ভেতর। বোঝা যায়, বাচ্চাটাকে নালার নিচে জমা শুকনো পাতার ওপর শুইয়ে দিয়েছিল হাতিটি। এতক্ষণ সে সেখানেই ঘুমোচ্ছিল। আর সারারাত তাকে পাহারা দিয়ে থেকেছে হাতিটি। রাইতিয়া বাচ্চাকে কোলে তুলে নিতেই ঘুম ভাঙা বাচ্চাটা জুড়ে দেয় কান্না। সে কান্নাকে ছাপিয়ে যায় রাইতিয়ার আনন্দকান্না। হাতিটি কোনোদিকে না তাকিয়ে চলতে থাকে ধীর পায়ে। স্তম্ভিত হয়ে সবাই তাকিয়ে সেদিকে। রাইতিয়ার দু' চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি।